আমি যে মা, আমার কি রাগ করতে আছে?

জিয়াউল হক

সারাদিন অফিস সেরে বাড়ীতে এসেই জামা কাপড় না ছেড়েই মেইল চেক করতে বসলাম। কম্পিউটর খুলে কেবল বসেছি এমন সময় রুমে প্রবেশ করল ঢাকার ছেলে তামিম। মারয়েশিয়ায় পড়া শেষ করে ব্রিটেনে এসেছে ফাইনাল ইয়ার করতে। উঠেছে আমার বাড়ীতেই। এখানে এই ইংল্যান্ড এ পড়তে এসে এশীয়ান প্রত্যেক ছাত্রই সুযোগ সুবিধামত কম বেশী কাজ করে কেউবা লেখা পড়ার আংশিক খরচ জোগাড় করে আর না হয় একটু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে নেয়। এই নিউক্যাসল শহরে বিশ্ববিখ্যাত তিন তিনটি ইউনিভার্সিটি থাকার সুবাদে এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্র ছাত্রীদের ভীড় লেগেই আছে। আর তাই এখানে ছাত্রদের জন্য পার্ট টাইম কাজের বাজারে খুবই প্রতিযোগীতা। মন মত একটা কাজ পাওয়া অনেকটা সোনার হরিনের মত যেন!। তামিম ইংল্যান্ড এ এসেই আমাকে ধরেছিল একটা কাজ জোগাড় করে দেবার জন্য। দিয়েছিলাম একটা পার্টটইম কাজ ধরে, একটা নার্সিং হোম এ, সেই নার্সিং হোমের ম্যানেজার আমার পরিচিতা ছিলেন, আমরা দুজনে একই সাথে ম্যানেজারিয়াল কোর্স করেছি। তার নাম এলিজাবেথ। আমরা লীজ বলেই জানি। তাকেই অনুরোধ করেছিলাম, সে আমার অনুরোধ রেখেছিল। তামিমকে একটা কাজ দিয়েছিল।

সেই তামিম ঘরে ঢুকেই আমার সামনে মুখটা কেমন মলিন করে দাঁড়াল। জানাল সে আর কাজে যাবে না সেখানে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, জানতে চাইলাম কেন সে কাজে যাবেনা? অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে সে যা বলল তা হলো সে কাজে যাবে না কারন সে সহ্য করতে পারছে না!। কি সহ্য করতে পারছ না তুমি? আমার এ প্রশ্নের জবাবে জানাল যে সে জেসি'র কান্না সইতে পারছেনা!।

আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সত্তর বৎসর বয়স্কা জেসি নিকলসন এর কথা। সত্তর বৎসর বয়স্কা বুড়ি জেসি। শারিরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হওয়াতে গত বৎসর দুয়েক ধরে তিনি একটি নার্সিং হোমে বসবাস করছেন এখন এটিই তাঁর বাড়ী, এটিই তাঁর ঘর! এটিই তাঁর পৃথীবি!!

সত্তর বৎসর বয়স্কা জেসীকে দেখলেই বোঝা যায় যে তিনি তাঁর যৌবনে অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গা'র রং লাল, ঠোঁট দুটো যেন আপেল এর মত লাল। মুখের

চামড়ায় শত ভাঁজ পড়ে গেছে, গালের চামড়াও ঝুলে গেছে নিচের দিকে। তাঁর চেহারায় সবচেয়ে আকর্ষনীয় দিকটা হলো সারা মুখটা জুড়ে একটা মায়াবী স্নীগ্ধতা ছড়িয়ে আছে সব সময় ধরে!। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মা'র কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর ফাইল ঘেঁটে সেখান হতে তথ্য নেব সে সুযোগ আমার নেই কারন আমি এখানে ছাত্র আমাকে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হোক তাঁর আস্থা অর্জন করতে হবে, কথোপকথন ও ভাব আদান প্রদানের মাধ্যমেই তাঁর কাছে থেকেই আমাকে জেনে নিতে হবে তাঁর জীবনাতিহাস, তাঁর সমস্যা আর কষ্টের কথা। তাঁর পুর্বাপর কিচিৎসা ও মেডিকেল হিস্ট্রি এর পরে সে সবের উপরে ভিত্তি করে আমাকেই তৈরী করে দিতে হবে তাঁর জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্য মানের একটি কেয়ার পান, একটি লং টার্ম রিহাবিলিটেশন পোগ্রাম, আর সেই পেপারই আমাকে জমা দিতে হবে ইউনিভার্সিটিতে। এটি একটি ঝামেলার কাজ, তবে বড় মজার কাজও বটে। এতে করে মানুষের অনেক গোপন দু:খ কষ্ট, তার জীবনের অনেক গোপন নাটকীয় ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎ বা নজরুল সহ পৃথীবির যে কোন বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত বিখ্যাত সব লেখাকেও হার মানায়!।

যাহোক আমাকে পাশ করতেই হবে, রেজিস্ট্রেশন যখন নিতেই হবে, তখন আর বসে থেকে লাভ কি? আমি লেগে পড়লাম জেসীর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরী করে নিতে। এখানকার বুড়ো বুড়িদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের একাকিত্ব। তারা বড় একা, একটু কথা বলা বা তাদের কথা শোনার মত একজন কাউকে পেলে তারা খুবই খুশী হন। আমিও সেটিকেই কাজে লাগালাম। সুযোগ পেলেই তাঁর ঘরে গিয়ে বসতাম, অনুমতি নিয়ে তাঁর পাশের সোফায় বসে টিভি দেখতাম তাঁর সাথে। প্রায়ই দেখতাম তিনি টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিখ্যাত সিরিজ নাটক " করোনেশন স্ট্রিট " দেখছেন। আমি একদিন বললাম

তুমি বোধ হয় নাটক পছন্দ করো জেসী?,

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি করো না?

বললাম, করি না তা না, তবে নাটক দেখার সময় নেই, তাই সঠিক করে বলা কঠিন পচ্ছন্দ করি কি না।

তিনি বললেন, আরে জীবনটাই তো নাটক, আমরা সবাই সেই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী বুঝলে বাছা?

আর এখন তো তোমার বয়স নাটক করার, দেখার বয়স এখনও হয়নি, দেখবে যখন আমার মত বয়স হবে, যখন নাটক করার মত সময় সুযোগ আর উপযুক্ত রোল তোমার জন্য থাকবেনা, তখন তোমার সময় হবে নাটক দেখার , তোমাকে দেখতেই হবে নাটক, তুমি না চাইলেও তোমাকে দেখতেই হবে, নিস্তার নেই এ থেকে! ।

কেমন একটা হেঁয়ালি কথা বার্তা। কি বলব ভেবে দেখছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর হাতে ধরে থাকা রিমোর্ট চাপলেন, এটি এক ধরনের যন্ত্র বিশেষ, হাঁসপাতালে প্রতিটি রুগীর কাছেই একটি করে থাকে, যে কোন প্রয়োজনে তারা তা চাপলে পুরো ফ্লোর জুড়ে এক ধরনের সংকেত বেজে ওঠে, ফ্লোরের দু প্রান্তে দুটো ও নার্সিং স্টেশনে একটি করে সুইচ বোর্ড আছে যাতে রুম নম্বর লেখা আছে এমন ব্যবস্থা সহ যে, যখনই এই রিমোর্ট যন্ত্রটি চাপা হোক না কেন উক্ত সুইচ বোর্ডে সংকেত জ্বলে উঠে, আর তা দেখে কেয়ার এ্যাসিস্টান্ট বা সিনিয়র কেয়ার এ্যাসিস্টান্টরা এসে শোনে তার প্রয়োজনের কথা এবং সে মত তারা ব্যবস্থা নেয়। মিনিট না যেতেই এক কেয়ার এ্যাসিস্টান্ট এসে হাজির হলে জেসি তার কাছে আজকের খবরের কাগজ আর সেই সাথে দুটো কফি চাইলেন, আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন

তোমার আপত্তি নেইতো কফিতে? বললাম, পছন্দ যখন তোমার, আমি না হয় কষ্ট করে গলার নিচে নামিয়ে দেব,

বলে হাঁসলাম, তিনি কফিই আনতে বললেন এবং তা কিছুক্ষনের মধ্যেই এলো। গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম জেসী তোমার শরীর এখন কেমন? তিনি হাঁসলেন, বললেন দেখ আমার শরীর খারাপ যাবে না আগামি অন্তত আরও তিরিশ বৎসর!

বললাম তা কেন, তুমি ভালো থাকো সেটা আমরা চাই কিন্তু আমরা জানি তোমার হাই বাড প্রেশার, তোমার মাঝে মাঝে নি:শ্বাসে কষ্ট হওয়া, তোমার মাজার ব্যাথা এসবতো লেগেই আছে, আমি সে ব্যাপারেই জানতে চাচ্ছিলাম।

তিনি আরও একবার হাঁসলেন, হাঁ, আমার সেগুলো আছে বটে, এবং সেগুলো আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে তাও সত্য, কিন্তু আমি যে কথা বলতে চেয়েছি তা হলো আমি আগামি তিরিশ বৎসরের মধ্যে মরব না, তুমি দেখে নিও।

আমিও তার কথায় এবার হেঁসে উঠলাম, বললাম দেখ জেসী তুমি শতায়ু হও, আমি চাই, কিন্তু মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না, কে কখন কোথায় মরবে এটা

জানা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কেউ কিন্তু মরতে চায় না, এই বিশ্ব ছেড়ে কেউই যেতে চায়না, সবাই এখানে পড়ে থাকতে চায় যত কষ্টই হোক না --

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না, তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন , বললেন সবাই হয়ত চায় কিন্তু আমি চাই না, আমি এ বিশ্বটা ছেড়ে চলে যেতে চাই , যদি সম্ভব হয় তবে এখন, এই মহুর্তে । আমি অপেক্ষায় আছি মৃত্যুর, কিন্তু আমি জানি আমি মরব না একশত বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত!

তাঁর মুখে আবারও সেই শতায়ু হবার কথা, তিনি বার বার জোরের সাথে সে কথাটিই বলে চলেছেন যে, তিনি একশত বৎসর বাঁচবেন। আমি তাঁকে এবারে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি করে জানলে যে তুমি ঠিকই একশত বৎসর বেঁচে থাকবে?

- কারন আমি বৃহস্পতিবারে জন্মেছি
- বৃহস্পতিবারে জন্মেছতো কি হয়েছে, এর সাথে শতায়ূ হবার কি সম্পর্ক আছে? জানতে চাইলাম,

তিনি এবারেও হাঁসলেন। বললেন বাছা আছে, আছে, বৃহস্পতিবার জন্ম নেয়া সন্তানরা শতায়ু হয়!। আমার মা নানীদের বলতে শুনেছি, বলে তিনি ভাংগা গলায় সুর করে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতে লাগলেন

Monday’s child is fare of face,
Tuesday’s child is full of grace,
Wednesday’s child is full of owe,
Thursday’s child has far to go;
Friday’s child is loving and giving,
Saturday’s works hard for living.

বেসুরো গলায় তাঁর গাওয়া শেষ করে তিনি আমার দিকে চাইলেন আর প্রশ্ন করলেন, “ বুঝেছ বাছা, আমি বৃহস্পতিবার জন্মেছি, আর তাই আমি শতায়ু হবো। আমি এই চোখ দিয়ে আরও কিছু দেখব, আমার এখনও অনেক দেখার বাঁকি আছে।

বললাম “ দেখ সপ্তাহের কোন দিনে তুমি জন্ম নিলে এর সাথে কতদিন বাঁচবে তার কোন সম্পর্ক নেই। এবং তা থাকা উচিৎও নয়। তোমাকে দেখেছি আগেই, আর তোমার কাছে আজ এখন এই ব্রিটিশ লোকগাঁথা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে তুমি বৃহস্পতিবারে নয় বরং সোমবার জন্মেছ।

বুড়ি হাঁসলেন, তাঁর চরিত্রের এই একটি দিক আমার খুব ভালো লাগে তিনি প্রতিটি কথাই সাধারনত হেঁসে হেঁসে বলেন! তিনি জানতে চাইলেন, কেন, তোমার এমনটা মনে হচ্ছে কেন?

তুমি খুবই সুন্দরী, সমবারের সন্তান যদি চারুমুখী হয়ে থাকে তবে তুমি সেই রকমই একজন!

তিনি আবারও হাঁসলেন, তবে তাঁর এবারের হাঁসিটা বড় করুন, বললেন, তা হয়ত সত্যিই বলেছ, আমি সুন্দরী ছিলাম। আর আমার এই রুপই আমার কাল হয়েছে, আমি যেন কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!, বললাম, সেটা কেমন? তিনি আমার দিকে চাইলেন, বললেন নাহ বাছা, সেটা আমারই কথা, আমারই থাক, বললাম্ আহা জেসি বলই না শুনি,

তিনি কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাছা, কোন বাগানের মাঝে দিয়ে হেঁটে গেছ কখনও? বললাম, জেসি, আমার বাড়ীর পাশেই একটা পার্ক, ঐ পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় একা একা হাঁটা আমার নিত্যদিনের অভ্যাস, সময় পেলেই আমি সেই পার্কের ভেতর দিয়ে একা একা হেঁটে বেড়াই। তিনি বললেন হাঁটো তো, বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় পা'র নিচে শুকনো ঝরা পাতা'র মচ মচ শব্দ শুনতে পাও? বললাম ঝরা পাতাতো থাকে তবে অত খেয়াল করে কি আর কেউ তা শোনে? আমিও শুনিনা। তবে ঐ সব পাতার উপরে দিয়ে কখনও হেঁটে যেতে ভালোইতো লাগে।

এবারে তিনি সরাসরি আমার দিকে চোখ রাখলেন, বললেন, আমরা এই বুড়ো বুড়িরা হলাম এই সমাজের ঝরা পাতা। আমাদের মেড়ে যেতে চায় সবায়, খেয়াল করেনা এইসব ঝরা পাতার বুকে কত কান্না লুকিয়ে আছে, সে সময়ই বা তাদের কই?

আমি বিস্মিত হলাম, তাঁর এই বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি আগে বুঝিনি, একটু অবাকই হলাম, বললাম, জেসি, আমি তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকলে দু:খিত, আমি চাইনা আমার কারনে পৃথীবির কোন মা কোন কষ্ট পাক, কারন আমার মা বেঁচে আছেন, আমি মনে করি আমি কোন মাকে কষ্ট দিলে আমার মা'কেও কেউ না কেউ কষ্ট দেবে ! আই এ্যম সরি। বুড়ি আমার দিকে চেয়ে রইলেন, বললেন, বাছা তুমি কোন কষ্ট আমাকে দাওনি, তুমি বুঝি তোমার মাকে ভালোবাস? বললাম, ' জেসি, কোন সন্তান এমন আছে কি যে তার মাকে ভালো না বাসে? আমি আমার মা'র জন্য কোন কষ্টের কথা ভাবতেও পারিনা, জেসি, আমার মা-ই

আমার দুনিয়া ’। জেসি আমার হাতের উপরে তাঁর একটা হাত রাখেলেন বললেন আহা বাছা বেঁচে থাক, তোমার মা’ও দীর্ঘজীবি হোক। কিন্তু জানো, আমরা সে সমাজ হারিয়ে ফেলেছি আমাদেরও একদিন এমন ছিল যেদিন সন্তানেরা তাদের বাবা মাকে ভালো বাসত কিন্তু আজ তা ইতিহাস। আজ আমাদের সন্তানেরাই আমাদের প্রতিদ্বন্দী, আমাদের কষ্টের কারন। তা না হলে, আমার কি নেই ?, আমার এ অবস্থা হবে কেন?, বুড়ির চোখ দিয়ে এবারে অশ্রু ঝরা আরম্ভ করেছে। আমি কিছু বললাম না, আমার মনে হয় এখন তিনি আরও কিছু বলবেন, আমি নিশ্চিত এখন এই কান্নার মহুর্তে তিনি যা বলবেন তা হবে তাঁর মনের গহীন হতে উঠে আসা নির্যাস যার ভেতরে কোন খাদ থাকবে না । তিনি বললেনও।

জেসী তাঁর যৌবনের শুরুতেই একজন বাস ড্রাইভারকে বিয়ে করেছিলেন, সে ঘরে তাঁর দুটো মেয়ে আছে। প্রায় এক যুগেরও বেশী সময় ভালোই চলেছে স্বামীর সাথে। এর পরে একদিন বলা নেই কওয়া নেই স্বামী প্রবর উধাও! ফোন করে জানালেন যে তিনি আদালতে ডিভোর্স চেয়েছেন, তিনি একটু একা থাকতে চান!। কিছুদিনের মধ্যেই ডিভোর্স হয়ে গেলে সে অন্য এক নারীর সাথে বসবাস আরম্ভ করে। জেসী হয়ে যান একা দুই কন্যা সহ। সাত আট বৎসর একাই থাকেন এবং বাঁচার তাক্বিদে এক দোকানে সেল্স গার্ল এর চাকুরী নেন। সেখানেই পরিচয় হয় তাঁর চেয়ে কম বয়সের নিক টড এর সাথে, ধীরে ধীরে তাদের সে জানা জানাজানি প্রনয়ে রুপ নিলে, তারা একত্রে বসবাস করতে থাকেন। দুই যুবতী কন্যা, সংসার আর চাকুরী নিয়ে জেসী ব্যস্ত এবং পুরোপুরি সংসারি!। কিছুদিন না যেতেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর প্রতি নিক এর আগ্রহ ক্রমশ কমে যাচ্ছে! তবে তা নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর মত সময় ছিলনা। এরই মাঝে একদিন কোন কিছু বুঝে উঠার আগে তিনি তার কর্মস্থলে বসেই টেলিফোন পেলেন নিক এর, নিক জানাচ্ছে যে সে আর রিটা দু জনে আলাদা জীবন শুরু করতে যাচ্ছে!। জেসী তার নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন, রিটা যে তাঁরই গর্ভজাত কন্যা! তাঁর গর্ভের কন্যা তাঁর এত বড় সর্বনাশ করবে? জেসীর মুখে কোন কথা আসার আগেই অপরপ্রান্ত হতে লাইন কাট!। কোনমতে টলতে টলতে বাড়ী এসে পেল একটি খাম, তার ভেতরে রিটার হাতে লেখা চিরকুট, “ মা ক্ষমা করে দিও ” তাঁর কিছুদনির মধ্যেই ছোট মেয়েটাও তার বয়ফ্রেন্ড এর হাত ধরে পাড়ি দিল। এবারে জেসী আক্ষরিক অর্থেই একা, একেবারে একা হয়ে গেলেন। মাস দুয়েক না যেতেই দেখা দিল হাই বাড প্রেসার, তিনি আক্রান্ত হলেন স্ট্রোক এ, এর পরে

সোস্যাল সার্ভিস, হাঁসপাতাল, এই করে করে শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমে স্থায়ী হয়েছেন। এটা নিশ্চিত যে, জীবনের বাঁকি কটা দিন তাঁকে এই নার্সিং হোমেই কাটাতে হবে।

তাঁর এ কাহিনি বলার শুরু থেকে তিনি একাধারে কেঁদে চলেছেন, আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম তাঁর দিকে তাকাতে। তাও প্রশ্ন করলাম, তোমার মেয়েদের আর কোন খবরাখবর পাওনি? তিনি বললেন, বড় মেয়েটা হয়ত লজ্জায়, অনুশোচনায় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারছেনা, ছোট মেয়েটা মাঝে মাঝে ফোন করে, তার নাকি তিনটি বাচ্চা, তারা একবার এসেছিল তাও বৎসর চারেক আগে!। এখন মাঝে মাঝে কার্ড পাঠায়, ফোন করে। কিন্তু বড় মেয়েটাকে তো আজ কুড়ি বৎসর হলো দেখিনা! আহা একটাবার যদি সে আমার সামনে আসত, একটাবার যদি তাকে দেখতে পেতাম!। আমি যে মা, আমার কি রাগ করে থাকলে চলে!।

জেসী সেই একইভাবে সারাটা রাত ধরে কেঁদে চলেন, তাঁর কান্নায় পাশের কেবিনের রুগীর অনেক সময় ঘুমুতেও পারে না। তখন তাঁর সাথে কোন না কোন কেয়ার এ্যাসিস্টান্ট কে বসতে হয় একটু শান্তনা দেবার জন্য একটু সঙ্গ দেবার জন্য!। এভাবেই ভদ্রমহিলা নির্ঘুম রাত কাটান। আর অপেক্ষায় থাকেন তাঁর স্বামীকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিজ ঔরসজাত কন্যাকে এক নজর দেখার জন্য!। কারন তিনি যে মা, মা'র কি রাগ করে থাকলে চলে!!।